জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৬

ISSN 2222-5188

৫ম পর্ব, ৩য় সংখ্যা

ইনফো মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

সূচী

বিশেষ প্রবন্ধ	৩
চমকপ্রদ তথ্য	৬
জনস্বাস্থ্য	৭
সাধারণ জিজ্ঞাসা	১০
চিকিৎসা	১১
ইনফো কুইজ	১৪
স্বাস্থ্যকথা	১৫

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

নতুন চিকিৎসা সম্পর্কীয় তথ্য এবং কিছু পরিচিত রোগ নিয়ে সাজানো হয়েছে ইনফো মেডিকাসের তৃতীয় সংখ্যাটি যা আপনাদের হাতে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত বোধ করছি। আশা করছি নতুন সংখ্যাটির তথ্যগুলো আপনাদের ভালো লাগবে।

স্ট্রোক হচ্ছে একটি ভয়ানক জরুরী অবস্থা। স্ট্রোক রোগটির নাম শুনলে যদিও হার্ট এটাক এর কথা মনে আসে, স্ট্রোক আসলে মস্তিস্কের একটি রোগ। মস্তিস্কের কোনো স্থানের রক্তনালী বন্ধ হয়ে গেলে বা ছিঁড়ে গেলে ঐ স্থানের রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে মস্তিস্কের ঐ বিশেষ এলাকা কাজ করতে পারেনা, এটিই হচ্ছে স্ট্রোক। মস্তিস্কের ঐ বিশেষ এলাকাটি শরীরের যে যে অংশকে নিয়ন্ত্রন করে স্ট্রোক হলে সে সকল অংশের বিভিন্ন অঙ্গ বিকল হয়ে পরে। অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, মাথায় তীব্র আঘাত ইত্যাদি কারণে স্ট্রোক হতে পারে। তাই এবারের “বিশেষ প্রবন্ধে” স্ট্রোকের এর কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও এর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এইডস ও হেপাটাইটিস এই দুটি রোগ হওয়ার অন্য একটি মাধ্যম হচ্ছে একজনের ব্যবহার করা সিরিঞ্জ অন্য কেউ ব্যবহার করা। আর এটা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় সেটা নিয়ে এবারের “চমকপ্রদ তথ্য” বিভাগটিতে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ডালিম সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য ও আয়ু বাড়ানোর ঔষধ সম্পর্কে নতুন তথ্য।

চোখ আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল অঙ্গ। সামান্য অবহেলা, অসাবধানতা, অজ্ঞতা ও সুচিকিৎসার অভাবে আমরা এই অমূল্য সম্পদ হারাতে পারি। তাই চোখের কিছু রোগ ও তার প্রতিকার নিয়ে “জনস্বাস্থ্য” বিভাগে তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে পোলিও ও পোলিও রোগের টিকা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে “জনস্বাস্থ্য” বিভাগে।

প্রোস্টেট পুরুষদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই প্রোস্টেট এর বিভিন্ন রোগ রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রোস্টেটাইটিস। এছাড়া পঞ্চাশ বছর বয়সের বেশি পুরুষের প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি একটি অন্যতম সাধারণ সমস্যা। এবারের “চিকিৎসা” বিভাগে প্রোস্টেটাইটিস ও প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি কি, কেন হয় ও এর চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সবশেষে আমাদের সাথে সব সময় থাকার জন্য এ সি আই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান)
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ম্যানেজার

সম্পাদক মন্ডলী
এম মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ আদনান রহমান
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী
ডাঃ মোঃ ইসলামুল হক

প্রকাশনায়
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই লিমিটেড
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন
ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

স্ট্রোক

মস্তিস্কের কোন অংশের কর্মক্ষমতা অতিদ্রুত (মিনিটের মধ্যে) হ্রাস পাওয়ার ফলে শরীরের যেকোনো অংশ অবশ হয়ে যেতে পারে, কথা বলা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যেতে পারে অথবা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। মস্তিস্কের কোন অংশে হঠাৎ রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে অথবা মস্তিস্কে রক্তনালী ছিড়ে গেলে উপরোক্ত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হলে তাকে স্ট্রোক বলে। বেশীর ভাগ স্ট্রোকই মস্তিস্কে রক্ত চলাচল কমে যাওয়া অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যই হয়। অক্সিজেনের অভাবে মস্তিস্কের কোষগুলো মারা যেতে শুরু করে এবং এর ফলে মানুষের মৃত্যু অথবা স্থায়ী পক্ষাঘাতের (Paralysis) সৃষ্টি হয়। স্ট্রোক যেকোনো বয়সেই হতে পারে। ৬৫ বছর বয়সের উপরে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি থাকে। ৫৫ বছর বয়সের পর প্রতি ১০ বছর স্ট্রোকের ঝুঁকি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। স্ট্রোকের পরে যারা বেঁচে থাকেন তারা অনেকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ, কথা বলতে না পারা, মানসিক সমস্যা ইত্যাদি অনেক অসুবিধায় ভোগেন। আধুনিক এবং উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে স্ট্রোক জনিত মৃত্যু ও স্থায়ী পক্ষাঘাতের ঝুঁকি কিছুটা কমিয়ে আনা যায় কিন্তু এসব চিকিৎসা স্ট্রোকের উপসর্গ শুরু হওয়ার সাথে সাথে শুরু করা উচিৎ।

স্ট্রোকের প্রকারভেদ

স্ট্রোককে প্রধানত দুই ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়ঃ

- কারণভেদে
  1. ইস্কেমিক স্ট্রোক
  2. রক্তক্ষরণ জনিত স্ট্রোক
- স্ট্রোকের উপসর্গের সময় ও আবির্ভাবের উপর ভিত্তি করে
  1. সাময়িক রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়া জনিত স্ট্রোক
  2. বিকাশমান স্ট্রোক
  3. সম্পন্ন স্ট্রোক

কারণভেদে

১. ইস্কেমিক স্ট্রোক (Ischemic stroke)ঃ মস্তিকে রক্ত এবং অক্সিজেন সরবরাহকারী রক্তনালী বন্ধ হয়ে গেলে ইস্কেমিক স্ট্রোক হয়। রক্ত জমাট বেঁধে রক্তনালী বন্ধ হয়ে গেলে এই স্ট্রোক হয়। সাধারনত এথেরোস্ক্লেরোসিস (Atherosclerosis) হয়ে রক্তনালী সরু হয়ে যেতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাগ (রক্তের কোলেস্টেরল এবং অন্যান্য চর্বি মিশ্রণে হয়) এবং জমাট রক্ত মিলে রক্তনালী সরু, শক্ত এবং কম স্থিতিস্থাপক করে তোলে। ফলে মস্তিস্কে রক্ত চলাচল কমে যায় অথবা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর এই রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়া জনিত স্ট্রোক শতকরা ৮৫% স্ট্রোকের কারণ।

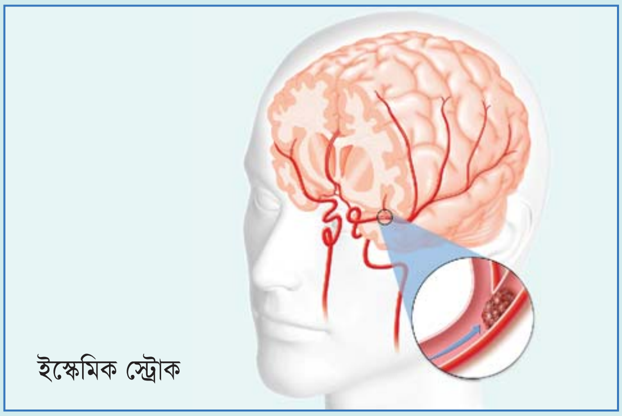

ইস্কেমিক স্ট্রোক

২. রক্তক্ষরণ জনিত স্ট্রোক (Haemorrhagic stroke)ঃ মস্তিস্কে রক্তনালী ছিঁড়ে রক্তক্ষরণের কারণে এই স্ট্রোকের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ভাবে এই রক্তক্ষরণ হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ মস্তিকের রক্তক্ষরণের অন্যতম প্রধান কারন। এনিউরিসম (যাহা রক্তনালীর গায়ে দুর্বল, পাতলা বেলুনের মত অংশ) ছিঁড়ে রক্তক্ষরণ হতে পারে। এথেরোস্ক্লেরোসিস হয়ে রক্তনালী পাতলা এবং ভঙ্গুর হলেও রক্তক্ষরণ হতে পারে। আর শতকরা ১৫% স্ট্রোকের কারণ হচ্ছে রক্তক্ষরণ জাতীয় স্ট্রোক।

রক্তক্ষরণ জনিত স্ট্রোক

স্ট্রোকের উপসর্গের সময় ও আবির্ভাবের উপর ভিত্তি করে

১. সাময়িক রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়া জনিত স্ট্রোক (Transient Ischemic Attack or TIA)ঃ সাময়িক রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়া জনিত স্ট্রোককে অনেক সময় "মিনি স্ট্রোক" ও বলে। ইহা সাধারণ স্ট্রোকের মতই শুরু হয় কিন্তু কোন রকমের অসুবিধা

ছাড়াই ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভাল হয়ে যায়। এই স্ট্রোক থেকে ভবিষ্যতে বড় ধরনের স্ট্রোক হতে পারে। মাঝে মাঝে এই স্ট্রোকের উপসর্গ এক ঘণ্টার মধ্যেই ভাল হয়ে যায়। তবে উপসর্গ কমে যাবে মনে করে অপেক্ষা করা উচিৎ না কারণ কোন স্ট্রোকে রোগী মারা যাবে অথবা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হবে সেটা বলা কঠিন।

২. বিকাশমান স্ট্রোক (Stroke in evolution)ঃ এই ধরনের স্ট্রোকে রোগীর উপসর্গসমূহ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। যদি জমাট রক্তের কারণে মস্তিস্কের রক্তনালী বন্ধ হয়ে ক্রমাগত মস্তিস্কের কোষ গুলো নষ্ট হতে থাকে অথবা মস্তিস্কের অভ্যন্তরে বার বার রক্তপাত হতে থাকে তখন এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

৩. সম্পন্ন স্ট্রোক (Completed stroke)ঃ এক্ষেত্রে স্ট্রোকের উপসর্গ সমুহ একবারেই প্রকাশিত হয় এবং তা আর বৃদ্ধি পায় না।

ঝুঁকি সমূহ

কিছু কিছু সমস্যা এবং জীবনযাত্রার কিছু কিছু উপাদান মানুষকে স্ট্রোকের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। যাদের ইতিমধ্যে স্ট্রোক হয়ে গেছে তাদের পরবর্তী স্ট্রোকের ঝুঁকি কমানোর জন্য ঝুঁকির উপাদান সমূহ কমাতে হবে। নিচে স্ট্রোকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কারণগুলো দেয়া হলঃ

- বয়সের সাথে সাথে স্ট্রোকের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়
- উচ্চ রক্তচাপ
- হৃদরোগ
- ডায়াবেটিস - ডায়াবেটিস রোগীদের স্ট্রোকের ঝুঁকি, যাদের ডায়াবেটিস নেই তাদের চেয়ে ২-৪ গুণ বেশি
- তামাকের ব্যবহার - তামাক স্ট্রোকের ঝুঁকি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে
- রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ - রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল এলডিএল (LDL) এর উচ্চ মাত্রার কারণে স্ট্রোক হয়
- এলকোহল
- বংশগত ঝুঁকি উপাদান - পরিবারের কারো যদি উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস থাকে তাহলে স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়

উপসর্গ

স্ট্রোক হলে সাধারণত নিচের উপসর্গগুলো দেখা যায়ঃ

- হঠাৎ করে একদিকের মুখমণ্ডল, হাত পা ইত্যাদি অবশ অথবা দুর্বল হয়ে যাওয়া
- হঠাৎ করে কাউকে চিনতে না পারা, কোন কিছু বুঝতে না পারা এবং মানসিক জড়তা হওয়া
- হঠাৎ এক চোখে দৃষ্টি হারানো অথবা উভয় চোখেই দেখতে না পাওয়া
- হঠাৎ শারীরিক ভারসাম্য হারানো, মাথা ঘুরানো অথবা হাঁটতে অসুবিধা হওয়া
- হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
- বার বার খিঁচুনি হওয়া
- চৈতন্যবোধ লোপ পাওয়া, এমনকি কোমায়ও চলে যাওয়া

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা

স্ট্রোকের প্রকারভেদ নিশ্চিত করার জন্য নিচের পরীক্ষাগুলো করা হয়ঃ

- সিটি স্ক্যান (CT Scan)
- এম, আর, আই (MRI)
- রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা

সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণ নির্ণয় এবং স্ট্রোক ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য নিচের পরীক্ষাগুলো করা হয়ঃ

- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা
- রক্তে ইলেক্ট্রোলাইট এর মাত্রা
- ইসিজি (ECG)
- ক্যারোটিড ডপলার
- ইকোকার্ডিওগ্রাফি

জটিলতা

স্ট্রোক থেকে অনেক ধরনের জটিলতা হতে পারে। নিচে স্ট্রোক থেকে যেসব জটিলতা হয়, সেগুলো দেয়া হলঃ

- পক্ষাঘাত (Paralysis)
- অজ্ঞান বা কোমায় চলে যাওয়া
- খিঁচুনি হওয়া
- প্রস্রাব ধরে রাখতে না পারা অথবা প্রস্রাব আটকে যাওয়া
- শরীরের বিভিন্ন অংশে ঘা হওয়া
- কথা বলতে সমস্যা হওয়া
- স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া

- বার বার স্ট্রোক হওয়া
- পায়ের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধা
- চোখে দেখতে অথবা দেখে বুঝতে সমস্যা হওয়া
- কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়া
- অথবা মৃত্যু

প্রাথমিক চিকিৎসা

প্রথমে রোগীকে একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া এবং রোগীর লোকের কাছ থেকে রোগের বিষয়ে তথ্য (History) সংগ্রহ করা এবং চিকিৎসা কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিকে তা সরবরাহ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিচে স্ট্রোক হলে প্রাথমিক পর্যায়ে কি কি করণীয় তা দেয়া হলঃ

- রোগীর শ্বাসনালী, শ্বাস প্রশ্বাস এবং রক্ত সঞ্চালন দ্রুত পরীক্ষা করা
- রোগীর মাথা এবং ঘাড়ের অংশ কিছুটা উপরের দিকে তুলে রোগীকে শুইয়ে দেওয়া। রোগীর এই অবস্থান মস্তিষ্কের রক্ত চাপ কমায়

- যদি এতে রোগীর অবস্থার উন্নতি না হয় তা হলে রোগীকে বাম দিকে কাত করে থুতনি উপরে দিকে টেনে ধরতে হবে। এতে রোগীর শ্বাসনালী উন্মুক্ত হবে এবং বমি করলে তা সহজে মুখ থেকে বের হয়ে আসতে পারবে
- স্ট্রোক হয়েছে এমনটি মনে করলে সে রোগীকে কখনও কিছু খেতে বা পান করতে দেয়া যাবে না। খাদ্যনালী অবশ থাকার কারণে রোগী কিছু গিলতে পারবে না। এ অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য মুখে দিলে তা সরাসরি শ্বাসনালীতে এবং ফুসফুসে প্রবেশ করে aspiration pneumonia করতে পারে
- রোগীকে নাড়াচাড়া করতে নিষেধ করতে হবে
- এমনকি যদি অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য হয় (যেমন-মিনিস্ট্রোক) তাহলেও রোগীকে পরে পূর্ণ চিকিৎসা নেওয়ার জন্য বলতে হবে। কারণ মিনিস্ট্রোক ভবিষ্যতে বড় ধরনের স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়

ব্যবস্থাপনা

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে একবার স্ট্রোক হয়ে গেলে কোনভাবেই পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই প্রাথমিক অবস্থায় সহায়ক সেবা প্রদানের মাধমে স্ট্রোকের জটিলতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করা এবং রোগীর পুনর্বাসন করা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোগীর দৈহিক অবস্থার এবং কর্মদক্ষতার উন্নতিতে পরিচর্যা এবং ফিজিওথেরাপি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

প্রতিরোধ

প্রত্যেক মানুষের স্ট্রোকের ঝুঁকির উপাদানসমূহ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। পদক্ষেপ গুলো হচ্ছেঃ

- উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ - প্রয়োজনমত জীবন যাত্রার মান পরিবর্তন অথবা সুনির্দিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ করা। প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক লোককেই তাদের উচ্চ রক্তচাপ নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা উচিৎ
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ করা - শারীরিক ওজন কমানো এবং নিয়মিত ব্যায়াম করার মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা
- তামাক, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা এবং সাদাপাতার ব্যবহার না করা
- হৃদরোগের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা করা যেমন - এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন (Atrial fibrillation) রোগের যথাযথ চিকিৎসা করা
- রক্তের উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরলের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ করা
- এলকোহল সেবন বন্ধ করা
- শারীরিক ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা
- নিয়মিত বায়াম করা - সপ্তাহের বেশীরভাগ দিনেই কমপক্ষে ৩০ মিনিট ব্যায়াম করা
- প্রচুর পরিমাণে তাজা ফল ও শাক সবজি খাওয়া
- চর্বি এবং কোলেস্টেরল মুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা
- লবণ, ঘি, বাটার, পাম তেল এবং পোড়া তেলে ভাজা খাবার ইত্যাদি পরিহার করা
- দুশ্চিন্তা পরিহার করা

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

এইডস, হেপাটাইটিস রোধে আসছে সুপার সিরিঞ্জ

একটি সিরিঞ্জ একবার ব্যবহারের পর সেটা আবার ব্যবহারের কারণে প্রতি বছর সারা বিশ্বে প্রায় বিশ লাখ মানুষ এইচআইভি এবং হেপাটাইটিস ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে। অন্যের ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ব্যবহারের কারণে যেসব রোগের সংক্রমণ ঘটে সেসব বন্ধ করার জন্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বড় ধরনের একটি অভিযান শুরু করেছে। এই সংক্রমণ ঠেকাতে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি এখন ২০২০ সালের মধ্যে স্মার্ট সিরিঞ্জের ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। সাধারণ সিরিঞ্জ একাধিকবার ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু এই সিরিঞ্জটির সূঁচ এরকম হবে যা একবারের বেশি ব্যবহার করা যাবে না। একবার ব্যবহারের পর আপনা আপনিই ভেঙে যাবে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ডালিমে রয়েছে তারুণ্য ধরে রাখার উপাদান

ডালিমের নানা পুষ্টিগুণের কথা জানা গেলেও তারুণ্য ধরে রাখার গুণটির কথা অনেকেই জানেন না। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, ডালিম তারুণ্য ধরে রাখতে সহায়তা করে, অর্থাৎ দেহের বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয় এ ফলটি। আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি জানিয়েছে, ডালিম স্মৃতিশক্তি ও বয়স ধরে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া ডালিম আলঝেইমার্সের মতো মস্তিষ্কের রোগ প্রতিরোধ করে, মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি উন্নত করে এবং শরীর ফুলে যাওয়া প্রতিরোধ করে। পাশাপাশি এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ক্যান্সার প্রতিরোধী উপাদান।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

আয়ু বাড়ানোর ঔষধ

বিজ্ঞানীরা বয়স বাড়ার আসল কারণ বের করেছেন। আর তা থেকেই বয়স কমানোর ঔষধ আনা সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। গবেষণায় জানা গেছে, জিএসকে-৩ নামক একটি প্রোটিন মলিকিউল আমাদের আয়ু কমানোর জন্য দায়ী। আর এটাকে যদি কমানো যায় তাহলে আয়ু বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যাতে জিএসকে-৩ রয়েছে, এমন একটি ফল নিয়ে গবেষণা করে দেখা গিয়েছে লিথিয়াম ব্যবহার করে এই ফলগুলোর আয়ু বাড়ানো যাচ্ছে অন্তত ১৬ শতাংশ। গবেষকদের ধারণা লিথিয়াম কিংবা সমগোত্রীয় কোনও ওষুধ যার বেশি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে না, সেগুলি ব্যবহার করে আয়ু বাড়ানো সম্ভব।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

চোখের রোগ

দৃষ্টিশক্তির সমস্যা

প্রেসবাইওপিয়াঃ ইহা চোখের কোন রোগ নয়। বয়স জনিত কারণে চল্লিশ বা তার উপরের বয়সে চোখের গঠনগত কিছু পরিবর্তন হয়, চোখের লেন্সের স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায়। ফলে কাছে দেখার জন্য লেন্সের আকার পরিবর্তনের ক্ষমতা কমে যায় এবং উক্ত বয়সে কাছের জিনিস ঝাপসা দেখায়। শুধু কাছের জিনিস দেখার জন্য উত্তল বা প্লাস লেন্স ব্যবহার করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

মায়োপিয়াঃ এ ধরনের রোগীরা কাছে মোটামুটি ভালো দেখতে পারলেও দূরে ঝাপসা দেখে, তাই এদের ক্ষীণদৃষ্টি বা মায়োপিয়া বলা হয়। অবতল লেন্স বা মাইনাস পাওয়ারের চশমা পরলে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। কারো চোখে যদি ছয় ডায়াপ্টারের বেশী মাইনাস পাওয়ারের লেন্স লাগে এবং কারো বয়স বাড়ার সাথে সাথে যদি চোখের পাওয়ারও বাড়তে থাকে, তখন তাকে প্যাথলজিক্যাল মায়োপিয়া বলে। সেক্ষেত্রে চোখের দেয়াল বা স্ক্লেরা পাতলা হয়ে যায় এবং রেটিনায় ছিদ্র সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তীকালে রেটিনা আলাদা হয়ে গিয়ে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। মায়োপিয়াতে চোখের আকার বড় হওয়ার কারণে দেয়াল পাতলা হয়ে যায়। সে জন্য সামান্য আঘাতেই চোখে অনেক মারাত্বক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

হাইপারমেট্রোপিয়াঃ এ ধরনের রোগীরা দূরে এবং কাছের উভয় দিকেই ঝাপসা দেখে এবং অফিসিয়াল কাজ করার সময় রোগীর চোখের ওপর চাপ পড়ার কারণে মাথাব্যথার অনুভূতি হয়। স্বাভাবিক চোখের চেয়ে এদের চোখ একটু ছোট থাকে, যদিও ওটা বোঝা যায় না। উত্তল বা প্লাস লেন্সের চশমা ব্যবহার করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

অ্যাসটিগমেটিজমঃ এটি এক ধরনের দৃষ্টিস্বল্পতা, যেখানে রোগীর কর্নিয়ার যেকোনো এক দিকে পাওয়ার পরিবর্তন হয়, যার ফলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। এর কারণে একটি জিনিসকে দুটি দেখে এবং মাথা ব্যথা হতে পারে। সিলিন্ডার লেন্স ব্যবহারে এই সমস্যার সমাধান হয়।

নেত্রনালীর প্রদাহ বা ডেক্রাইওসিস্টাইটিস্

আমাদের দেশের পেক্ষাপটে এটা খুবই পরিচিত রোগ। এতে সব সময় চোখ থেকে পানি পড়ে এবং চোখের কোণায় চাপ দিলে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বের হয়। বার বার নালী বন্ধ হয়ে চোখের পানি সেখানে জমে গিয়ে তা ফুলে যায় এবং জীবাণু সংক্রমণের কারণে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এন্টিবায়োটিক সেবনে এ রোগ সাময়িকভাবে ভালো হলেও বারবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে ডিসিআর (DCR) অপারেশনের মাধ্যমে নেত্রনালীর সাথে অন্য আর একটি পথে নাকের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এতে রোগীর পানি পড়া বন্ধ হয়।

কর্নিয়ার আলসার বা চোখের ঘা

চোখ নষ্টের অন্যতম কারণ হচ্ছে কর্নিয়ার আলসার বা চোখের ঘা। কর্নিয়ার আলসার বিভিন্ন কারণে হতে পারে তবে আঘাতজনিত কারণ হলো প্রধান। এছাড়া শিশুদের ক্ষেত্রে অপুষ্টি জনিত কারণে কর্নিয়ার আলসার হতে পারে। আমাদের দেশের শিশুদের অন্ধত্বের অন্যতম কারণ হচ্ছে কর্নিয়ার আলসার। এছাড়াও কোনো কারণে চোখে জীবাণুর সরাসরি সংক্রমণেও আলসার বা ঘা হতে পারে। আলসারের প্রারম্ভে চোখে ব্যথার অনুভূতি হয়। অনেকে কর্নিয়ার আলসার চিকিৎসার নামে শামুকের পানি, চুন পড়া ইত্যাদি চোখে দেয় যা সমস্যাকে আরো তীব্রতর করে। প্রকৃত চিকিৎসা যত দেরি হবে, কর্নিয়ার ঘা তত খারাপ হতে থাকে। স্টেরয়েড বা হরমোন জাতীয় চোখের ড্রপের যত্রতত্র ব্যবহারের কারণে কর্নিয়ার ঘা বেরে গিয়ে ছিদ্র হতে পারে, এতে রোগীর সমস্যা আরও জটিল হয়ে যায়। কিন্তু যদি প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের চিকিৎসা করা হয় তাহলে তা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। প্রথমে আলসার থেকে পুঁজ নিয়ে পরীক্ষা করে জীবাণু চিহ্নিত করে সেই জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর ওষুধ প্রয়োগ করে আস্তে আস্তে ঘা কমিয়ে আনা সম্ভব।

গ্লুকোমা

গ্লুকোমা এমন একটি রোগ যেখানে চোখের চাপ বেড়ে গিয়ে চোখের স্নায়ুকে অকার্যকর করে ফেলে যার ফলে ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি চলে যায়। সাধারণ চোখের চাপ ১০-২০ মি.মি. মার্কারি। যখন চোখের এই চাপ বেরে যায় তখন গ্লুকোমা হয়। গ্লুকোমা হলো বাংলাদেশ তথা পৃথিবীতে অনিবারণযোগ্য অন্ধত্বের অন্যতম কারণ। যেকোনো বয়সে এ রোগ হতে পারে। জন্মের সময় বেশ

বড় চোখ এবং উচ্চ চক্ষুচাপ নিয়ে জন্মালে একে কনজেনিটাল গ্লুকোমা বা জন্মগত উচ্চ চক্ষুচাপ বলে। এটি তরুণ বয়সেও হতে পারে, তখন একে বলে জুভেনাইল গ্লুকোমা। আর বেশিরভাগ গ্লুকোমা রোগ ৪০ বছরের পর হয়, এদের প্রাথমিক গ্লুকোমা বলে। চোখের জন্মগত গঠনের ত্রুটি, আঘাত, ডায়াবেটিসজনিত চোখের রক্তহীনতা, অনিয়ন্ত্রিত স্টেরয়েড বা হরমোন থেরাপি, ছানি পেকে যাওয়া ইত্যাদি কারণে গ্লুকোমা হতে পারে। গ্লুকোমাতে আক্রান্ত রোগীদের কিছু উপসর্গ দেখা যায় যেমন হঠাৎ করে এক চোখে দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে, তার সাথে প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও বমি বমি ভাব হতে পারে অথবা উভয় চোখের দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে এবং চশমার পাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। চোখের চাপ স্বাভাবিক থেকে বেশি হলে পরীক্ষার মাধ্যমে গ্লুকোমা শনাক্ত করে দ্রুত চিকিৎসা করা বাঞ্ছনীয়।

ইউভিয়াইটিস

চোখের পুষ্টি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রক্তনালীপূর্ণ একটি স্তর বা লেয়ার আছে, যাকে ইউভিয়াল বা ভাস্কুলার কোট বলে। আর এই ভাস্কুলার কোটে যদি প্রদাহ হয়, তাহলে তাকে ইউভিয়াইটিস বলে। চোখে আঘাত, জীবাণুর সংক্রমণ, কানেকটিভ টিস্যু বা যোজক কলার রোগ ইত্যাদি কারণে এ রোগ হতে পারে। চোখে ব্যথা, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, আলোতে দেখতে সমস্যা হওয়া, মাথাব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ। শিশুদের ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ অনেক দেরীতে বোঝা যায় বলে তা জটিল আকার ধারন করে। বাতরোগ, ফুসফুসের রোগ, কিডনিরোগ ও যৌন রোগের সাথেও এ রোগের উপস্থাপন হতে পারে। সময়মত চিকিৎসা না করালে এই রোগ থেকে ছানি পড়া, গ্লুকোমা, রেটিনার রোগ এমনকি অন্ধও হয়ে যেতে পারে। এই জন্য এই রোগের দ্রুত চিকিৎসা করা উচিৎ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ হোমাট্রপিন অথবা এট্রোপিন আইড্রপ যা দু-তিন বার ব্যবহার করলে ব্যথা এবং প্রদাহ দুটিই কমে যায়। রোগের উপসর্গ এবং উপস্থাপনভেদে স্টেরয়েড এবং এন্টিবায়োটিক ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

চোখ টেরা

চোখের মাংসপেশী চোখকে একটি নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান করতে সাহায্য করে। মাংসপেশীর সহায়তায় চোখকে এদিক সেদিক নাড়ানো যায়। কোনো কারণে কোনো মাংসপেশী দুর্বল হয়ে গেলে চোখ উল্টো দিকে বেঁকে যায়, একে চোখ টেরা বলে। মাংসপেশীর রোগ, স্নায়ুরোগ, আঘাত ইত্যাদি কারণেও চোখ টেরা হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে টেরা হওয়ার জন্য দৃষ্টিস্বল্পতা হতে পারে। এছাড়া চোখের ক্যান্সার হলেও (রেটিনোব্লাসটোমা) শিশুদের চোখ টেরা হয়ে যেতে পারে। একটি জিনিসকে দুটি দেখা, দৃষ্টিস্বল্পতা, মাথাব্যথা ইত্যাদি টেরা চোখের প্রাথমিক লক্ষণ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে টেরা চোখের কারণ ও ধরন বের করা জরুরী। শিশুদের ক্ষেত্রে দৃষ্টিস্বল্পতার ত্বরিত চিকিৎসা প্রয়োজন। চশমা দিয়ে দৃষ্টিস্বল্পতা দূর করে শিশুদের অনেক টেরা চোখ সোজা করা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় ব্যায়ামের মাধ্যমে টেরা চোখের চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে। দৃষ্টিকটু বিধায় টেরা চোখের স্থায়ী চিকিৎসা হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে অপারেশন করা হয়ে থাকে। এতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বাঁকা চোখ সোজা হয়ে যায়।

ব্লেফারাইটিস

এটি হলো আইলিড বা চোখের পাতায় অবস্থিত চুলের গোড়ার প্রদাহ। এতে চোখের চুলকানি, আলোতে চোখ বন্ধ হয়ে আসা, চোখে জালাপোড়া করা ইত্যাদি অনুভূতি হতে পারে। চোখের নিয়মিত পরিচর্যা যেমন - মাথার খুশকি ও চোখের চুলের গোড়া পরিস্কার করা এবং ওষুধ সেবনের মাধ্যমে এ রোগের আক্রমণ রোধ করা সম্ভব।

টোসিস

এটি হলো চোখের মাংসপেশীর রোগ। এতে চোখের পাতা নিচে নেমে যায়। আঘাত, স্নায়ু দুর্বলতা, বার্ধক্যজনিত কারণে এ রোগ হতে পারে। সমস্যা খুব বেশী হলে অপারেশনের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা সম্ভব।

চোখের অঞ্জলি

এটি চোখের চুলের গোড়ায় অবস্থিত মোল গ্রন্থির প্রদাহ। এতে গ্রন্থির নিঃসরণ জমে ইনফেকশন হয়ে চুলের গোড়া ফুলে উঠে এবং চোখের পাতায় প্রচন্ড ব্যথা অনুভূত হয়। গরম সেক ও ওষুধ ব্যবহারে এ রোগ ভালো হয়। বার বার যাদের অঞ্জলি হয় তাদের ডায়াবেটিসের শনাক্ত করার জন্য রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করা উচিত।

মেওয়া বা কেলাজিয়ন

এটি চোখের পাতার ভিতর অবস্থিত মিবোমিয়ান গ্রন্থির দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ। যার ফলে চোখের পাতার ভিতরের অংশ ফুলে যায় এবং এখানে কোনো ব্যথা অনুভূত হয় না। বারবার মেওয়া বা কেলাজিয়ন হলে দৃষ্টি স্বল্পতাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে দৃষ্টি পরীক্ষা এবং দৃষ্টি স্বল্পতা থাকলে চশমা দেয়া যেতে পারে। অপারেশনের মাধ্যমে এর চিকিৎসা করা যায়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

পোলিও

পোলিও বা পোলিওমাইলাইটিস এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ যেটা স্নায়ুতন্ত্রের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। সাধারণত ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের পোলিও হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি জরিপে দেখা যায় যে, প্রতি ২০০ জন পোলিও ভাইরাসে আক্রান্ত শিশুর মধ্যে ১ জনের শরীর পুরো জীবনের জন্য প্যারালাইসিস বা অবশ হতে পারে। এই রোগে শিশুর এক বা একাধিক অঙ্গ অবশ হয়ে যায়। ফলে আক্রান্ত অঙ্গ দিয়ে স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। ধীরে ধীরে আক্রান্ত অংশের মাংসপেশী শুকিয়ে যায়। শ্বাস প্রশ্বাসের পেশী অবশ হলে শ্বাস বন্ধ হয়ে শিশু মারাও যেতে পারে। পোলিও টিকা না দেয়া হলে এই ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায়।

কারণ

পোলিও ভাইরাসের (Polio virus) মাধ্যমে পোলিও রোগ ছড়িয়ে পরে। এই ভাইরাস শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে। এই ভাইরাস পায়ু পথে অথবা মুখের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। যে সকল স্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব থাকে সেখানে এই ভাইরাস দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পোলিও ভাইরাস আছে এমন খাবার, পানি ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পরে। এছাড়া পোলিও ভাইরাস রোগীর মলমূত্র দিয়েও পোলিও ভাইরাস বের হয়।

প্রকারভেদ

১. স্পাইনাল টাইপঃ এই ধরনের পোলিওতে শিশুদের দুই পা অথবা দুই হাত অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে এক হাত অথবা এক পা অবশ হয়ে যেতে পারে। এই পোলিওতে মানব দেহে ভাইরাস দ্রুত বাড়তে থাকে এবং স্নায়ুকোষের সন্ধিগুলোতে প্রবেশ করে যার ফলে মাংসপেশী দুর্বল হয়ে যায়। স্পাইনাল টাইপ পোলিও হলে শিশুর হাত পা অবশ হয়ে যায় যার ফলে শিশু দাঁড়াতে চায় না।

২. বালবার টাইপঃ এই ধরনের পোলিওতে স্নায়ুতন্ত্রের যে সমস্ত কেন্দ্র শ্বাস প্রশ্বাস, হৃদস্পন্দন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে, সেই সব কেন্দ্রসমূহ আক্রমণ হয়। যার ফলে তাড়াতাড়ি শিশুর শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং শিশুরা খেতে পারে না।

৩. স্পাইনো বালবার টাইপঃ এ ধরনের পোলিওতে স্পাইনাল নার্ভ আক্রান্ত হয়, যার ফলে পানি খেতে গেলে তা নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে, গলার স্বর বসে যায়।

৪. এনকেফালাইটিস টাইপঃ এই ধরনের পোলিও শিশুর মস্তিষ্ককে আক্রান্ত করে। যার ফলে রোগীর মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়।

চিকিৎসা

এ রোগের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে অক্সিজেন দেয়া, রোগীর রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন এর দিকে লক্ষ রাখা। হাত, পা অবশ হয়ে গেলে ব্যায়াম করাতে হবে বা ফিজিও থেরাপি দিতে হবে। পোলিও আক্রান্ত শিশুর মলমূত্র ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত যথাযথভাবে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে, কেননা পোলিও জীবাণু খাবার বা পানীয়তে মিশে গেলে তা থেকে পরিবারের অন্যদের, বিশেষত অন্য শিশুর হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আক্রান্ত শিশুকে প্রথম সপ্তাহে ইমিউনোগ্লোবিন দেয়া যেতে পারে।

পোলিও টিকা দেয়ার সময়

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীতে (ইপিআই) শিশুকে ৬ সপ্তাহ, ১০ সপ্তাহ, ১৪ সপ্তাহ ও ৯ মাস বয়সে মোট ৪ বার ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন (ওপিভি) টিকা দেয়া হয়। তবে বর্তমানে এই কর্মসূচীতে ইনএ্যাকটিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন (আইপিভি) সংযোজন করা হয়েছে। ওপিভি টিকা আগের মতোই শিশুর ৬, ১০ ও ১৪ সপ্তাহ বয়সে দেয়া হবে সাথে ১৪ সপ্তাহ বয়সে ওপিভি টিকার সঙ্গে এক ডোজ আইপিভি টিকা দেয়া হবে। এ টিকা দেয়ার ফলে ৯ মাস বয়সে ওপিভি টিকার ৪র্থ ডোজটি শিশুদের আর নেয়ার প্রয়োজন হবে না। যেহেতু ৫ বছরের পরে পোলিও হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তাই ৫ বছরের মধ্যেই পোলিও টিকা দিয়ে দেওয়া উচিৎ।

১৫০ টির বেশি দেশে পোলিও নির্মূলে পুরানো টিকার বদলে নতুন একটি টিকার ব্যবহার শুরু হয়েছে। রোগটি নির্মূলের চেষ্টায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এক বিবৃতে জানিয়েছেন। পোলিও ভাইরাসের তিন ধরনের স্ট্রেইন রয়েছেঃ টাইপ ১, টাইপ ২ এবং টাইপ ৩। পূর্বে ৩ ধরনের স্ট্রেইন এর জন্য টিকা ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে টাইপ ২ পোলিও স্ট্রেইনটি আর মানুষের মধ্যে নেই। এখন টাইপ ১ এবং টাইপ ৩ নির্মূল করাই এই নতুন টিকাটির উদ্দেশ্য।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

প্রশ্নঃ গর্ভাবস্থায় যেকোনো ব্যথা ও প্রসব ব্যথার মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করা যায়?

উত্তর

গর্ভাবস্থার শেষ দিকে প্রায়ই পেট শক্ত হয়ে যায় এবং পেটে ব্যথা অনুভূত হয় যা বিশ্রাম নিলে বা ওষুধ খেলে কমে যায়। কিন্তু প্রসবের ব্যথা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর উঠতে থাকে এবং এর তীব্রতা কমে না বরং বাড়তেই থাকে ব্যথা। এই ব্যথা তলপেটের পেছন দিকে অথবা সামনের দিক হতে পারে যা কোনো ঔষধ খেলে অথবা বিশ্রাম নিলে চলে যায় না। যদি এর সঙ্গে পানি ভেঙে যায় তাহলে আর কোনো সন্দেহই থাকবে না যে এটা প্রসব ব্যথা।

প্রশ্নঃ শীতকালের রোদ ত্বকের জন্য ক্ষতিকর নয়, এই ধারণা কি ঠিক?

উত্তর

ধারণাটি ঠিক নয়। বরং গরমকালের রোদের চেয়ে শীতের রোদে ত্বকের ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। রোদের প্রখরতা কম থাকায় শীতের রোদে সবাই একটু বেশি সময় কাটায়। এতে সানবার্ন হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। আবার রোদের তীব্রতা কম থাকা এবং বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্প কম থাকার কারণে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি অনেকটা সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে আসে যা ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। তাই শীতকালের রোদ ত্বকের জন্য ক্ষতিকর।

প্রশ্নঃ কানে হেডফোন বা ইয়ারফোন বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা কি খারাপ?

উত্তর

কানে হেডফোন বা ইয়ারফোন বেশি সময় ধরে ব্যবহার করলে কানে ব্যথা, অস্বস্তি ও অস্বাভাবিক শব্দ হতে পারে। এ ছাড়া বহিঃকর্ণের প্রদাহ ও সংক্রমণের ঝুঁকিও বাড়ে। দীর্ঘসময় ধরে কানে হেডফোন ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি কমে যেতে পারে। এ ছাড়া গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে কানে হেডফোন ব্যবহার করার কারণে রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা প্রবণতাও বেড়ে যায়। তাই গান শোনা বা ফোনে কথা বলার জন্য অতিরিক্ত ও বেশি সময় ধরে কানে হেডফোন ব্যবহার করা উচিত নয়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

প্রোস্টেটাইটিস

প্রোস্টেট একটি গ্রন্থি যা পুরুষদের মূত্রাশয়ের নিচে থাকে। কাঠ বাদামের সমান এর আকৃতি। এটি একমাত্র পুরুষদেরই থাকে, যার কাজ হলো প্রোস্টেট রস বা সিমেন (Semen) নিঃসৃত করা। কোনো অবস্থায় যদি এ রস উপাদানে পরিবর্তন ঘটে কিংবা এর ক্ষরণ প্রতিহত হয় তাহলে প্রোস্টেটে অনেক ধরনের রোগ হতে পারে। এ রোগসমূহের মধ্যে একটি হলো প্রোস্টেটাইটিস। সাধারণত ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

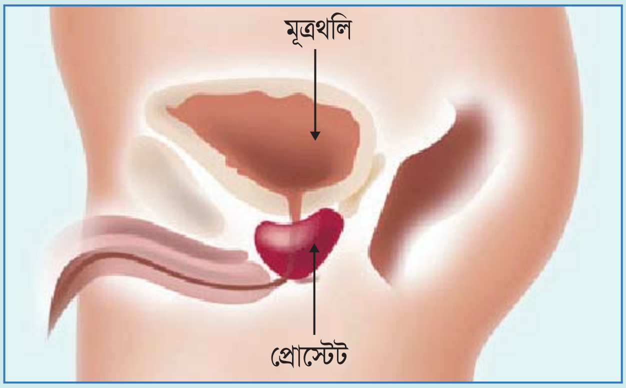

কারণ

বিভিন্ন কারণে প্রোস্টেটাইটিস হতে পারে। নিচে এর কারণগুলো দেয়া হলঃ

- ব্যাকটেরিয়া জনিত কারণে
- শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে
- স্নায়ুর কোন রোগ হলে
- প্রোস্টেট গ্রন্থিতে আঘাত পেলে

এছাড়া আরও কিছু কারণ আছে যেগুলো থেকে প্রোস্টেটাইটিস হতে পারে। সেগুলো হলঃ

- ইউরিক এসিড এর পরিমাণ বেড়ে গেলে
- ইউরেথ্রা সরু হয়ে গেলে
- প্রোস্টেট গ্রন্থিতে ক্যান্সার অথবা পাথর হলে

প্রকারভেদ

প্রোস্টেটাইটিস দুই ধরনের হতে পারেঃ

- একিউট বা তাৎক্ষণিক প্রোস্টেটাইটিস
- ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী প্রোস্টেটাইটিস

একিউট বা তাৎক্ষণিক প্রোস্টেটাইটিস

কারণ

সাধারণত ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণে একিউট বা তাৎক্ষণিক প্রোস্টেটাইটিস হয়ে থাকে। অ্যাকিউট প্রোস্টেটাইটিসের জন্য সচরাচর দায়ী ব্যাকটেরিয়াটির নাম ই.কলাই *(E. coli)*। এছাড়া ক্লেবসিলা (Klebsiella), এন্টারোব্যাকটার (Enterobacter), সিউডোমোনাস (Pseudomonas) নামক গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকরেটিয়ার সংক্রমণ বা ইনফেকশনের কারণেও একিউট প্রোস্টেটাইটিস হতে পারে।

জীবাণুর প্রবেশ পথ

ব্যাকটেরিয়া সাধারণত প্রোস্টেট গ্রন্থিতে তিনটি উপায়ে প্রবেশ করেঃ

- মূত্রনালীর উপরিভাগের সংক্রমণের মাধ্যমে
- প্রোস্টেটনালী সংক্রমিত হওয়ার মাধ্যমে
- মলনালীর সংক্রামিত রক্ত বা লসিকানালী (Lymphatic) এর মাধ্যমে

উপসর্গ

যারা একিউট বা তাৎক্ষণিক প্রোস্টেটাইটিসে ভুগছেন তাদের নিচের উপসর্গগুলো দেখা দিতে পারেঃ

- হঠাৎ করেই রোগীর দেহে জ্বর আসে, রোগী কাঁপতে থাকে এবং তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়
- পিঠের নিচে এবং তলপেটে ব্যথা হয়
- ঘন ঘন প্রস্রাব হয়
- প্রস্রাবে তীব্র ইচ্ছা থাকে কিন্তু প্রস্রাব করতে কষ্ট হয় এবং জ্বালাপোড়া করে

প্রস্রাবের সময় রোগী এত ব্যথা অনুভব করে যে, ভয়ে প্রস্রাবই করতে চায় না যার ফলে তলপেট ভারী মনে হয়। মলাশয়ে খোঁচা অনুভব করে এবং পায়খানার সময় ব্যথা লাগে।

পরীক্ষা

- ডিআরই (DRE)ঃ পায়ুপথে আঙুল ঢুকিয়ে প্রোস্টেট গ্রন্থির স্ফীতি এবং তার অমসৃণতা পরীক্ষা করা
- সম্পূর্ণ রক্ত পরীক্ষা
- রক্তের কালচার
- প্রস্রাবের রুটিন পরীক্ষা
- প্রস্রাবের কালচার

চিকিৎসা

প্রোস্টেট গ্রন্থির নিঃসরণ কালচার করলে নির্ভরযোগ্য জীবাণু চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। যেহেতু ব্যাকটেরিয়াজনিত মূত্রাশয়ের প্রদাহ থেকে এই রোগ হতে পারে, তাই প্রস্রাব কালচার করেও রোগের কারণ চিহ্নিত করা যেতে পারে। কালচারের ফলাফলের ওপর

ভিত্তি করে নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিক প্রদান করা হয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেরি করলে নানা জটিলতা দেখা দেয়। এপিডিডাইমিস এবং অন্ডকোষে ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়তে পারে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে ওষুধটি বেশি ব্যবহৃত হয় তা হলো ট্রাইমেথোপ্রিম ও সালফামেথোক্সাজলের মিশ্রণ। অবশ্য বর্তমানে সিপ্রোফ্লক্সাসিন বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাথে ব্যথা ও জ্বরনাশক ওষুধও দেয়া হয়। রোগীকে অন্তত ছয় সপ্তাহের জন্য যৌনমিলন থেকে বিরত থাকতে হবে। ইনফেকশনের জন্য যেসব রোগীর প্রস্রাব আটকে যায়, তাদের তলপেটের নিচে ছিদ্র (Supra pubic puncture) করে একটি নল দিয়ে মূত্রথলির সাথে সংযুক্ত করা হয়। মূত্রনালী পথে ক্যাথেটার প্রয়োগ মোটেই উচিত নয়।

ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী প্রোস্টেটাইটিস

কারণ

এক্ষেত্রে মূত্রনালীতে একই জীবাণু কর্তৃক পুনরায় সংক্রমণ হয়ে থাকে। অ্যাকিউট প্রোস্টেটাইটিসের চিকিৎসাকালে রোগীকে যে ওষুধ প্রদান করা হয়, খামখেয়ালিবশত কিংবা ইচ্ছাকৃত রোগী ওষুধের কোর্স সম্পূর্ণ না করলে অসম্পূর্ণ চিকিৎসার ফল হিসেবে ক্রনিক প্রোস্টেটাইটিস বা দীর্ঘস্থায়ী প্রোস্টেটের প্রদাহ দেখা দেয়।

ক্রনিক প্রোস্টেটাইটিস এ অধিকাংশ রোগীর প্রোস্টেট গ্রন্থিতে পাথর দেখা যায়। স্বাভাবিক পুরুষদের ক্ষেত্রে এ পাথর সাধারণত ছোট থাকে, তবে তা গুচ্ছ আকারে থাকে। ব্যাকটেরিয়াজনিত দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণে সাধারণত একাধিক বড় পাথর দেখা যায়। এসব পাথর সংক্রমিত হয় এবং পরে তা মূত্রপথকে সংক্রমিত করে।

উপসর্গ

দীর্ঘমেয়াদি প্রোস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ অধিকাংশ রোগীর অসাবধানতার ফসল নিচে ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী প্রোস্টেটাইটিসে আক্রান্ত রোগীর উপসর্গগুলো দেয়া হলঃ

- প্রস্রাবে তীব্র আকাঙ্খা থাকে
- ঘন ঘন প্রস্রাব হয়
- রাতে অতিরিক্ত প্রস্রাব হয়
- তলপেটে ও পিঠের নিচে ব্যথা হয়
- বীর্যপাতের সময় ব্যথা অনুভূত হয়
- বীর্যরসে রক্তের উপস্থিতি থাকতে পারে
- পুরুষত্বহীনতা দেখা দিতে পারে

চিকিৎসা

ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী প্রোস্টেটাইটিসেও প্রস্রাব কিংবা প্রোস্টেট রস কালচার করে এন্টিবায়োটিক দেয়া হয়। এখানে লক্ষণীয় যে এন্টিবায়োটিক চলার সময় প্রস্রাব জীবাণুমুক্ত হয় ও রোগের উপসর্গ কমে যায়। কিন্তু প্রস্রাব বা প্রোস্টেট রস সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করতে হলে এন্টিবায়োটিক এর সম্পূর্ণ কোর্স গ্রহন করা উচিৎ। ট্রাইমেথোপ্রিম ও সালফামেথোক্সাজল চমৎকার কাজ করে। ৪ থেকে ১৬ সপ্তাহ চিকিৎসা চালিয়ে রোগমুক্তির হার দেখা গেছে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ। প্রোস্টেটের পাথরের রোগীদের কেবল মেডিক্যাল থেরাপিতে কাজ হয় না, অপারেশনের প্রয়োজন হয়। যদিও জীবাণুবিরোধী ঔষধ রোগের উপশম নিয়ন্ত্রণ ও প্রস্রাব জীবাণুমুক্ত করতে পারে, কিন্তু শুধু অপারেশনের মাধ্যমে সব সংক্রমিত পাথর ও আক্রান্ত প্রোস্টেট টিস্যু অপসারণ করে রোগীকে স্থায়ীভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি

অধিকাংশ পুরুষেরই বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রোস্টেট বড় হয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। প্রোস্টেট গ্রন্থি আকারে বড় হয়ে গেলে এটি মূত্রনালীর উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে মূত্রথলি ও মূত্রত্যাগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এটি বিনাইন প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া (Benign prostatic hyperplasia) বা বিপিএইচ (BPH) নামেও পরিচিত। যথাসময়ে চিকিৎসার অভাবে বড় হয়ে যাওয়া প্রোস্টেট গ্রন্থি স্বাভাবিক মূত্রত্যাগের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে, এমনকি এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যার ফলে মূত্রনালী ও কিডনিতে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয়।

সাধারণ প্রোস্টেট গ্রন্থি

প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

কারণ

মূত্রথলির ঠিক নিচে প্রোস্টেট গ্রন্থি অবস্থিত। যে নালীর সাহায্যে মূত্র মূত্রথলি থেকে মূত্রনালীতে সরবরাহিত হয় তা প্রোস্টেটের কেন্দ্রে অবস্থিত। প্রোস্টেট বড় হয়ে গেলে এই নালীটি সরু হয়ে যায় ও মূত্র প্রবাহ ব্যাহত হয়। অধিকাংশ পুরুষের বয়স বৃদ্ধির (৫০ বছরের অধিক) সঙ্গে সঙ্গে প্রোস্টেট গ্রন্থি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এই গ্রন্থি অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে গেলে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করে। ঠিক কি কারণে এই গ্রন্থি বড় হতে থাকে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে ধারণা করা হয়, বয়স বাড়ার সাথে একজন ব্যক্তির সেক্স হরমোনের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে। হরমোনের এই পরিবর্তনকেই প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধির কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

উপসর্গ

প্রোস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধির ফলে নিচের উপসর্গগুলো দেখা যায়ঃ

- ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া
- ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হওয়া
- প্রস্রাব করার পরও প্রস্রাবের থলি খালি না হওয়া
- প্রস্রাবের বেগ আটকিয়ে রাখা অসম্ভব হওয়া
- প্রস্রাবের গতি দুর্বল হওয়া ও মাঝ পথে বন্ধ হওয়া
- প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যাওয়া
- প্রস্রাব একেবারে আটকে যাওয়া বা আটকানোর মতো হওয়া
- তলপেটে তীব্র ব্যথা অনুভূত হওয়া

পরীক্ষা

ডিআরই (DRE)ঃ প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হয়েছে কি না তা দেখার জন্য মলদ্বারে আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এতে প্রোস্টেট গ্রন্থির আকার ও কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কি না তা বোঝা যায়।

পিএসএঃ পিএসএ হলো একটি উপাদান যা প্রোস্টেট থেকে উৎপাদিত হয়। প্রোস্টেটের সমস্যা হলে এটির পরিমাণ বেড়ে যায়।

ইউরোফ্লোমেট্রিঃ ইউরোফ্লোমেট্রির মাধ্যমে প্রস্রাবের গতি ও প্রস্রাব প্রবাহের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়।

পিভিআরঃ প্রস্রাব করার পর মূত্রথলিতে প্রস্রাব রয়েছে কি না তা নির্ণয় করতে পিভিআর করা হয়। এটি করা হয় সাধারণত আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে।

অন্যান্যঃ কখনো কখনো প্রস্রাবের সমস্যার কারণ খুঁজতে প্রেসার - ফ্লো দেখার প্রয়োজন হয়। প্রোস্টেট গ্রন্থির সঠিক মাপ জানতে এবং কোনো ক্যান্সার আছে কি না তা পরীক্ষা করতে প্রোস্টেটের আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা খুব সহায়ক।

চিকিৎসা

রোগের লক্ষণ এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা দেয়া হয়ঃ

জীবন যাত্রার মান পরিবর্তন

মূলত জীবন যাত্রার ধরন পরিবর্তন করে বা পানি ও তরল খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে প্রোস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি রোধ করা যায়। এক্ষেত্রে ওষুধ সেবনের প্রয়োজন হয় না।

মেডিক্যাল চিকিৎসা

ফিনাস্টেরাইডঃ এটি একটি ঔষধ, যা প্রোস্টেট গ্রন্থিকে সঙ্কুচিত করে এবং এর ফলে প্রস্রাবের উপসর্গের উন্নতি ঘটে। কখনো কখনো এটি কয়েক মাস গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে।

আলফা ব্লকারঃ আলফা ব্লকার ওষুধগুলো প্রোস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধির চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এসব ওষুধ প্রোস্টেটের পেশীগুলোকে শিথিল করে এবং এর ফলে প্রস্রাবের উপসর্গগুলো কমে যায়।

শল্য চিকিৎসা

টিইউআরপিঃ প্রোস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধির জন্য ট্রান্সইউরেথ্রাল রিসেকশন অব দ্য প্রোস্টেট বা টিইউআরপি হলো সাধারণ শল্য চিকিৎসা। এ ক্ষেত্রে মূত্রপথ দিয়ে একটা যন্ত্র ঢুকিয়ে প্রোস্টেটের সেই পয়েন্ট পর্যন্ত যাওয়া হয়, যেখানে প্রস্রাবের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তারপর সেখানের অতিরিক্ত টিস্যু কেটে ফেলা হয়। শরীরের বাইরে কোনো কাটাছেঁড়া করা হয় না।

লেজার সার্জারিঃ প্রোস্টেট সমস্যা নিরাময়ে ব্যবহৃত এই পদ্ধতি অত্যন্ত নিরাপদ এবং এই পদ্ধতিতে সার্জারি করলে রক্তপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। লেজার প্রোস্টেটেকটমির পর মাত্র ২ দিন হাসপাতালে থাকতে হয়। পেসমেকার বসানো হার্টের রোগী এবং রক্ত তরল রাখার ওষুধ সেবনরত রোগীদের ক্ষেত্রেও এই অপারেশন ঝুঁকিমুক্ত।

ওপেন প্রোস্টেটেকটমিঃ প্রোস্টেট গ্রন্থি খুব বেশি বড় হলে ওপেন প্রোস্টেটেকটমির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। এ ক্ষেত্রে তলপেট কেটে অপারেশন করা হয় এবং প্রোস্টেট গ্রন্থির অংশ বের করে আনা হয়। এই চিকিৎসায় সাধারণত প্রস্রাবের সমস্যা দ্রুত সমাধান হয়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ "স্ট্রোক" থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই কার্ডটি আগামী ২৫ জুলাই ২০১৬ ইং তারিখের মধ্যে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবেন।

১) শরীরের কোন অংশ আক্রান্ত হলে স্ট্রোক হয়?

ক) যকৃত
খ) মস্তিষ্ক
গ) হৃদপিণ্ড
ঘ) কিডনী

২) ৫৫ বছর বয়সের পর প্রতি ১০ বছরে স্ট্রোকের ঝুকি কতগুন বৃদ্ধি পায়?

ক) ১ গুণ
খ) ২ গুণ
গ) ৩ গুণ
ঘ) ৪ গুণ

৩) নিচের কোনটি রক্তক্ষরণ জনিত স্ট্রোকের কারণ?

ক) হৃদপিণ্ডের রক্তনালী ছিড়ে গেলে
খ) মস্তিষ্কের রক্তনালী ছিড়ে গেলে
গ) হৃদপিণ্ডে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে
ঘ) মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল

৪) নিচের কোনটি স্ট্রোকের কারণ নয়?

ক) উচ্চ রক্তচাপ
খ) ডায়াবেটিস
গ) তামাকের ব্যবহার
ঘ) নিয়মিত ব্যায়াম করা

৫) নিচের কোনটি রোগটির কারণে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে?

ক) উচ্চ রক্তচাপ
খ) ডায়াবেটিস
গ) জন্ডিস
ঘ) উচ্চ কোলেস্টেরল

৬) নিচের কোনটি স্ট্রোকের উপসর্গ নয়?

ক) হঠাৎ করে একদিকের মুখমণ্ডল দুর্বল হয়ে যাওয়া
খ) হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
গ) বুকে ব্যাথা হওয়া
ঘ) বার বার খিঁচুনি হওয়া

৭) স্ট্রোকের নিশ্চিতকরন পরীক্ষা কোনটি ?

ক) এম, আর, আই
খ) লিভার ফাংশন টেস্ট
গ) সেরাম ক্রিয়েটিনিন
ঘ) এন্ডোস্কপি

৮) স্ট্রোকের প্রাথমিক চিকিৎসা নয় কোনটি?

ক) রোগীর শ্বাসনালী পরীক্ষা করা
খ) রোগীকে শুইয়ে দেওয়া
গ) রোগীকে পানি পান করানো
ঘ) রোগীকে আশ্বস্ত করা

৯) নিচের কোন খাবারটি স্ট্রোকের ঝুকি বাড়ায়?

ক) তাজা ফল
খ) শাকসব্জি
গ) তেল চর্বিযুক্ত খাবার
ঘ) রুটি

১০) স্ট্রোকের জটিলতা নয় কোনটি?

ক) পক্ষাঘাত
খ) খিঁচুনি
গ) কোমা চলে যাওয়া
ঘ) ডায়রিয়া

ঢেঁড়সের ৭ টি উপকারী গুণ

ঢেঁড়স ভাজি, ঢেঁড়সের তরকারি পছন্দ করেন না এমন লোক পাওয়া কঠিন। ঢেঁড়স দেখতে অনেকটা নারীর আঙুলের মতো হওয়ায় একে লেডিস ফিঙ্গারও বলা হয়। ঢেঁড়স অত্যন্ত পুষ্টিকর ও ঔষধিগুণ সম্পন্ন। এখানে ঢেঁড়সের উপকারী গুণগুলো তুলে ধরা হল।

১ হাঁপানিতে শ্বাসকষ্ট কমায়

ঢেঁড়স হাঁপানী রোগে খুব উপকারী। প্রাচীন হারবাল চিকিৎসায় হাঁপানি রোগ সারাতে ঢেঁড়সকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হতো, কারণ ঢেঁড়স শ্বাসকষ্ট কমাতে সাহায্য করে।

২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে

ব্লাড সুগার কমাতে ঢেঁড়সের তুলনা নেই। ঢেঁড়সে রয়েছে থায়ামিন, নিয়াসিন, রিবোফ্লাভিন যা ডায়াবেটিক রোগীর স্নায়ুতন্ত্রে পুষ্টি সরবারাহ করে ডায়াবেটিক রোগীকে সতেজ রাখে। তাই ডায়াবেটিক রোগীদের প্রতিদিনের খাবারে ঢেঁড়স রাখা উচিত।

৩ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে

ছোট থেকে বড় বয়সের যেকোনো মানুষ কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগে থাকেন। যারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগেন তাদের জন্য ঢেঁড়স খুবই উপকারী। কারণ ঢেঁড়সে রয়েছে প্রচুর আঁশ আর এই আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। ঢেঁড়স সহজে হজম হয় বলে বিপাক ক্রিয়াতেও সহায়তা করে।

৪ ত্বককে উন্নত করে

ঢেঁড়স ত্বকের জন্য খুব উপকারি। ঢেঁড়স খেলে ব্রণ কম হয়, ত্বকের ময়লা পরিষ্কার হয়, রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে, তাই ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

৫ হাড় ও দাঁত মজবুত করে

প্রতি ১০০ গ্রাম ঢেঁড়সে রয়েছে ৬৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১.৫ মিলিগ্রাম লোহা। ফলে ঢেঁড়স হাড়কে মজবুত রাখে। দাঁত ও মাড়ির রোগেও ঢেঁড়স উপকারী।

৬ খারাপ কোলেস্টেরল কমায়

ঢেঁড়সের মধ্যে রয়েছে সলিউবল ফাইবার (আঁশ) পেকটিন, যা রক্তের খারাপ কোলেস্টেরলকে কমাতে সাহায্য করে এবং এথেরোস্ক্লেরোসিস প্রতিরোধ করে।

৭ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

ঢেঁড়স রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চ পরিমাণ ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। এছাড়া রয়েছে আরো প্রয়োজনীয় মিনারেল যেমন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ যা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ADVANCING
POSSIBILITIES